গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭১ বর্ষ ৩২ সংখ্যা | ২২ - ২৮ মার্চ ২০১৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান মার্কস স্মরণে

‘শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি সংগ্রামের অর্থ শ্রেণির জন্য সুযোগ সুবিধা ও একচেটিয়া কর্তৃত্ব অর্জন করা নয়। সম অধিকার ও সম কর্তব্য প্রতিষ্ঠা করা ও সমস্ত শ্রেণি শোষণের অবসান ঘটানো।’

— কার্ল মার্কস

১৪ মার্চ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উদগাতা, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান কার্ল মার্কসের ১৩৬তম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের সর্বত্র এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এই উপলক্ষে উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, বুক স্টল ইত্যাদির আয়োজনও করা হয়েছিল।

দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন এবং মহান মার্কসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ এবং বহু কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

নীতির বুলিটুকুও রাখল না বিজেপি

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলে দিয়েছেন, নীতির বালাই রাখার দরকার নেই, যে ভাবে হোক জেতাটাই বড় কথা। পশ্চিমবঙ্গের দলীয় নেতাদের তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কথা বলে যাদের প্রার্থী করা হয়েছিল তারা কেউ জিততে পারেননি। ফলে এই লোকসভা ভোটে আর নীতি ও আদর্শ-স্বচ্ছতা এসব বিচারের দরকার নেই।

সর্বভারতীয় সভাপতির নির্দেশ শিরোধার্য করে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, হৃদয় এবং দলের দরজা তাঁরা এত বড় করে ফেলেছেন, যেকোনও লোককে গ্রহণ করতে তাঁদের অসুবিধা নেই। প্রার্থীর গায়ে দুর্নীতির দাগ থাকলেও অসুবিধা নেই, (পড়ুন, চোর ডাকাত হলেই বা কী!)। তাঁদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না। বিজেপি তাকে সাদরে গ্রহণ করে নেবে, জেতাটাই আসল (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ)।

নীতির বালাই রাখব না বলেও অমিত শাহ কথা রাখেননি, এমন অভিযোগ বিজেপির অতিবড় শত্রুতেও তুলতে পারবে না। আসলে বিজেপির রাজনীতিতে নীতি-নৈতিকতা-আদর্শ এসবের বালাই কোনও দিনই ছিল না। কিন্তু এমন জোর গলায় সে কথা প্রকাশ্যে বলতে হয়নি।

দুয়ের পাতায় দেখুন

মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ

১৫ মার্চ বারুইপুরে এসডিও দপ্তরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির ডাকে বিক্ষোভ। নেতৃত্বে দেন এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী কমরেডস জয়কৃষ্ণ হালদার, সুজাতা ব্যানার্জী, পূর্ণচন্দ্র নাইয়া এবং রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেডস তরুণ মণ্ডল, নন্দ কুন্ডু প্রমুখ

নিউজিল্যান্ডের বর্বর হত্যাকাণ্ড ফের দেখাল
সন্ত্রাসবাদের কোনও জাত-ধর্ম নেই

নিউজিল্যান্ডের এক মসজিদে সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রায় ৫০ জন সাধারণ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং আরও ৫০ জনের গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা দেখিয়ে দিল সন্ত্রাসবাদের ছোবল থেকে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ কোনও অংশের মানুষই মুক্ত নয়। একই ভাবে দেখাল সন্ত্রাসবাদীরও বিশেষ কোনও ধর্ম, বর্ণ বা জাত নেই। ইসলাম, খ্রিস্টান, হিন্দু কোনও ধর্মের সাথেই সন্ত্রাসবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। ধর্মের নামটুকু ব্যবহার করে মাত্র। কোথাও সন্ত্রাসবাদী কৃষ্ণবর্ণ, কোথাও শ্বেত। সন্ত্রাসবাদ বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের কুৎসিত লক্ষণগুলির একটি।

ঘাতক বেন্টন ট্যারান্ট তার হত্যাকাণ্ডের ঠিক আগে অনলাইনে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। তার ছত্রে ছত্রে রয়েছে মুসলিম আর শরণার্থীদের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও অতি দক্ষিণপন্থায় চরম বিশ্বাস। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, ২৮ বছরের এই তরুণ, যাকে তার ঠাকুমা ‘খুব ভাল ছেলে’ বলেছেন, সে এমন ঘৃণা আর বিদ্বেষের শিকার হল কী করে? তার ‘শ্বেতাঙ্গ আত্মপরিচয়’কে জাগিয়ে তোলার জন্য ট্যারান্ট এই ইস্তাহারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ দিয়েছে। ইস্তাহারে লিখেছে, ‘শ্বেতাঙ্গরাই সর্বশ্রেষ্ঠ’ এই মতাদর্শে বিশ্বাস করে সে। সে নিজেকে একজন ফ্যাসিস্ট বলে পরিচয় দিয়েছে। ভারতের নাম উল্লেখ করেও সে লিখেছে, “ইউরোপের মাটি থেকে এই দখলদারদের সরাতে হবে।”

সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের পরিকল্পনা অনুযায়ী

পাঁচের পাতায় দেখুন

চটকল শ্রমিক আন্দোলনে বিভেদে
শক্ত হল মালিকদের হাতই

সাম্প্রতিক চটকল ধর্মঘট থেকে কী পেলেন শ্রমিকরা? ধর্মঘটের দাবি ছিল, ৮টি বন্ধ চটকল খুলতে হবে, ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা করতে হবে, ৬ হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে। বদলি শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ, ঠিকা প্রথা রদ, পি এফ গ্র্যাচুইটির বকেয়া প্রদান ইত্যাদি দাবিতে এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ২১টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন যৌথভাবে ১ মার্চ থেকে এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। পরে ধর্মঘট ২ সপ্তাহ পিছিয়ে দিয়ে ১৫ মার্চ থেকে করার কথা বলা হয়। ধর্মঘটের আহ্বানের মধ্য দিয়ে যে চাপ তৈরি হয়েছে এবং তার ফলে যে কয়েকটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়ে গেল তাতে কী পেলেন চটশিল্পের আড়াই লক্ষ শ্রমিক? ১৩ মার্চ যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয় তাতে স্বাক্ষরই বা করল কারা? কেন সকলেই করল না?

১৩ মার্চ শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যে চুক্তি প্রস্তাব পেশ করেন তাতে মূল দবিগুলি চূড়ান্ত উপেক্ষা করা হয়েছে। নামমাত্র কিছু দাবির প্রতি ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়া হয়েছে। যেমন, নতুন শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ১১২ টাকা বাড়িয়ে ৩৭০ টাকা করা হয়েছে, কিন্তু পুরনো শ্রমিকদের বেতন বাড়ানো হয়েছে মাত্র ২ টাকা— যা ভিক্ষাতুল্য। ৯০ শতাংশ স্থায়ী শ্রমিক রাখার বিষয়টি হাইকোর্টের এক প্রাক্তন বিচারপতির অধীনস্ত কমিটির বিবেচনার জন্য দেওয়া হয়েছে

দুয়ের পাতায় দেখুন

নীতির বুলিটুকুও রাখল না বিজেপি

একের পাতার পর

এখন পাঁচ বছর সরকার চালিয়েই দেশের মানুষের যে ক্ষোভের ঝড়ের মুখে তাঁরা পড়েছেন, তাতে রাখ-ঢাক বজায় রাখাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। এখন জিততে গেলে চোখের চামড়াটুকু বজায় রাখলেও যে চলবে না, তা বুঝেই এমন কথা বলতে হচ্ছে।

শুধু তাঁরা নন, ভোট রাজনীতির পুরো পরিসর জুড়ে বয়ে চলেছে নীতিহীনতার এক কদর্য স্রোত। এই পশ্চিমবঙ্গেই ক'দিন আগে কংগ্রেসের তিন বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দিয়েও পুরনো দল থেকে পদত্যাগ করেননি। কারণ দলত্যাগ বিরোধী আইনে তাঁদের এমএলএ পদটা চলে যেতে পারে। কিন্তু তৃণমূল তাঁদের লোকসভার ভোটের টিকিট দিতেই তাঁরা রাতারাতি কংগ্রেস থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করে তৃণমূল হয়ে গেলেন। কংগ্রেসের এক প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির ডিগবাজিও দেখেছে পশ্চিমবঙ্গ বাসী। তিনি ২০১১ থেকে কয়েক বছর তৃণমূলের বিরুদ্ধে অনেক গলা ফাটিয়ে অবশেষে গদির আশায় তৃণমূলেই নিজেকে সঁপে দিয়ে রাজ্যসভার সাংসদ হয়ে ছিলেন। এখন আবার লোকসভা ভোটে 'অনুপ্রেরণা' লাভ করেছেন। মাঝখানে ২০১৬ তে রাহুল গান্ধী-বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে একত্রে পরানো বিশাল মালার ফাঁকে তাঁর মুখটিও শোভা পেয়েছিল। এদিকে, উত্তর মালদার বিজয়ী কংগ্রেস সাংসদ এবার একই জায়গা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। চমক আরও বাকি, তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে যাঁর নাম শোনা যাচ্ছে, তিনি গতবারে সিপিএম প্রার্থী হিসাবে লড়েছিলেন একই কেন্দ্রে। তিনি আবার সিপিএম বিধায়কও বটে। অর্থাৎ এমনটি ঘটলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একই থাকলেও, পাল্টে যাবে তাঁদের সাইনবোর্ড দুটি। তৃণমূলের বাহুবলী নেতা বলে খ্যাত উত্তর চব্বিশ পরগণার এক বিধায়কও টিকিট না পেয়েই সোজা বিজেপির পায়ে পড়েছেন। বিজেপি কয়েকমাস আগেও তাঁর বিরুদ্ধে যে সব বাছা বাছা বিশেষণ দিয়েছিল, সেগুলি গিলে ফেলে এখন তৈরি তাঁকেই টিকিট দিতে। তিনি আবার দিল্লি থেকে পশ্চিমবঙ্গে ফিরেই পঞ্চায়েত ভোটে গণতন্ত্র হত্যার চিত্রগুলি এতদিনে দেখতে পাচ্ছেন। শুধু এখন ভুলে গেছেন যে, এর অনেকগুলি অভিযোগ তাঁর নামেই। কিন্তু ক্ষমতার মধু এতটাই লোভনীয় যে, তখন প্রতিবাদ করে উঠতে পারেননি! চিটফান্ড কেলেঙ্কোরির অন্যতম নায়ক এক প্রাক্তন তৃণমূল নেতার ভরসায় বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে কিছু আসন জেতার কথা ভাবছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা থেকে শুরু করে সর্বভারতীয় সভাপতি, এমনকী প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত কেমন করে ভাগানোর স্লোগান দিয়েছিলেন, তা আজও এ রাজ্যের মানুষ ভোলেনি। কিন্তু এখন বিজেপির ছোঁয়ায় তিনি 'শুদ্ধ' হয়ে গেছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি এমনও বলেছেন, বিজেপিতে প্রার্থী হওয়ার উপযুক্ত লোক নেই। তাই তাঁরা অন্য দল ভাঙানোর চেষ্টায় রত। মানুষ জিজ্ঞাসা করতেই পারে, যে দলে উপযুক্ত প্রার্থীই নেই, সেই দলটির ভোট চাইবার অধিকারই বা থাকবে কেন?

এমন জামা বদলানোর মতো দল পাল্টানোর খেলা বুর্জোয়া সংসদীয় রাজনীতিতে অবশ্য নতুন কিছু নয়। তথাকথিত নির্বাচনী গণতন্ত্র আজ কত বড় প্রহসনে পরিণত হয়েছে তা এই খেলা দেখলেই অনেকটা বোঝা যায়। নীতি-আদর্শের বালাই রাখা তো অনেক পরের কথা, যে দুর্নীতি নিয়ে এই সমস্ত দলগুলির নেতারা একে অপরের বিরুদ্ধে গলা ফাটায় তারা নিজেরা প্রায় প্রত্যেকেই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে একেবারে ডুবে আছে। এই দল-বদলের কৌশলের সাথে নীতি-আদর্শের, জনকল্যাণের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই সব নেতারা যে এক দল ছেড়ে আর এক দলে যাচ্ছেন, তা এজন্য নয় যে, পুরনো দলটির নীতি আদর্শ সঠিক মনে না হওয়ায় তিনি আরও উন্নত নীতি-আদর্শের খোঁজে অপর একটি দলে যোগ দিচ্ছেন। কিংবা এক দলে থেকে জনগণের সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন না বলে অন্য একটি দলে গিয়ে সেই কাজ তিনি করতে চান। বাস্তবে এর কোনওটিই যে সত্য নয়, তা মানুষ হাড়ে হাড়ে জানে। এই সব নেতার দলবদলের একমাত্র কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করা। সাংসদ-এমএলএ-মন্ত্রী হয়ে জনগণের সম্পত্তির উপর লুঠপাঠ চালানো, দাদাগিরির অধিকার অর্জন, প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়া, দুর্নীতি করে আখের গুছিয়ে নেওয়া— এর বাইরে কংগ্রেস-বিজেপি-তৃণমূলের মতো জাতীয় বা আঞ্চলিক বুর্জোয়া দলগুলির নেতাদের দলবদলের অন্য কোনও কারণ নেই। স্বাভাবিকভাবেই জনগণের জন্য লড়াই, তাদের দাবিদাওয়া, প্রয়োজনকে সংসদীয় মঞ্চে তুলে ধরা এগুলি সবই পিছনে চলে যাচ্ছে। আর যেহেতু গোটা বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাই দুর্নীতির পাঁকে ডুবে গেছে, তাই এই রাজনীতির পক্ষে থেকে দুর্নীতির বিপক্ষে যাওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। বুর্জোয়া প্রচারমাধ্যমগুলি এই রাজনীতির চূড়ান্ত নীতিহীনতাকে আড়াল করতে ভোটে কে জিতবে, সেই ছদ্ম-লড়াইটাকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সামনে নিয়ে আসে।

একটা বিষয় অনেককেই ভাবিয়েছে, চিহ্নিত বুর্জোয়া দলগুলির নেতাদের সুযোগসন্ধানী চরিত্র না হয় বোঝা গেল। কিন্তু বামপন্থী দল সিপিএমের নানা স্তরের বহু নেতা, কর্মী, বিধায়ক এমনকী দু'একজন সাংসদ পর্যন্ত তৃণমূল কিংবা বিজেপির দরজায় লাইন দিচ্ছেন কী করে? বামপন্থী একটি দলে থেকে এতটুকু বামপন্থার চর্চা করলে এমনটি তো হওয়ার কথা নয়! দেখা গেছে কোনও আদর্শগত প্রশ্ন নয়, আখের গোছানোটাই আসল কারণ। অবশ্য এটা যে খুব অস্বাভাবিক নয়, তা সিপিএম দলের নেতাদের কার্যকলাপ দেখলেই অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়। দেশ জুড়ে যখন মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের বারুদ ফেটে পড়তে চাইছে, যে সময় দরকার ছিল বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঝড় তোলা। যার মধ্য দিয়েই একমাত্র বিজেপির সর্বনাশা সাম্প্রদায়িক ও করপোরেট মালিকদের স্বার্থবাহী রাজনীতির বিরুদ্ধে যথার্থ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব ছিল। এই কাজ করতে হলে কংগ্রেসেরও একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে পরিচালিত তথাকথিত নরম হিন্দুত্বের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মুখোশ খোলা দরকার ছিল। এস ইউ সি আই (সি) দল বারবার এই আন্দোলনের জন্য সিপিএম নেতৃত্বের কাছে আবেদন করলেও তাঁরা কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়ে কত ভোট বাড়তে পারে, দু-একটি আসন পাওয়া যায় কি না, এইসব হিসাব-নিকাশেই মশগুল থাকলেন। দীর্ঘদিন ধরে বিশেষত ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় বসার পর থেকে সিপিএম বামপন্থার চর্চা দূরে থাক, কী করে আরও বেশি ভোট জোগাড় করা যায়, কী করে, কাকে ম্যানেজ করে বা ধমক-চমক দিয়ে কিছু পঞ্চায়েত-এমএলএ-এমপি আসন বাড়ানো যায় এর মধ্যেই দলের পুরো শক্তি নিয়োজিত করেছিল। ক্ষমতার মধুভাণ্ডের চারপাশে ভিড় করা ক্ষমতালোভীদেরই দলের 'সম্পদ' বলে তুলে ধরে বামপন্থাকে কার্যত ভুলেই থাকতে চেয়েছিল তারা। তাই আজ যেখানে সুবিধা পাচ্ছে দলের নেতা-কর্মীরা সেখানেই ঘুরঘুর করছে। দলীয় নেতৃত্বও যেভাবে কংগ্রেস নেতৃত্বের পিছনে কয়েকটা সিটের জন্য উমেদারের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাও বামপন্থাকে দুর্বলই করছে। তাঁদের সাথে আর পাঁচটা বুর্জোয়া দলের সাইনবোর্ড আর কিছু বুকনি ছাড়া অন্য পার্থক্য থাকছে না। এর ফল সিপিএমকে ভোগ করতে হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে বামপন্থা যেভাবে কলঙ্কিত হচ্ছে তার বিষময় ফল আরও গভীর। এর ফলে ভোটে যেই জিতুক বিজেপির রোপন করা সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষকে শিকড়শুদ্ধ উপড়ে ফেলার কাজটা আরও কঠিন হবে। যেমন কঠিন হবে, একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে বেপরোয়া আক্রমণের মোকাবিলায় দেশব্যাপী শ্রমিক-কৃষক-খেটেখাওয়া সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলন গড়ে তোলা।

তাই এস ইউ সি আই (সি) দল এযুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে হাতিয়ার করে নির্বাচনী সংগ্রামকে গণআন্দোলনের পরিপূরক সংগ্রামে পরিণত করার লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে। এই লড়াইয়ে আজ সামিল হতে হবে সমস্ত স্তরের খেটেখাওয়া মানুষকে। করপোরেট পুঁজি পরিচালিত সংবাদমাধ্যমের প্রচারে ভেসে যাওয়া নয়। বিচার করতে হবে প্রার্থীকে, তার দল, তার রাজনীতিকে খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে। কে জিতবে কে হারবে —এর হিসাব কষে রাজা-উজির তৈরির মোহ নয়, ভোটের সময় খোলা মনে বিচার করতে হবে জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানে প্রার্থী এবং তাঁর দল কী উদ্যোগ নিয়েছেন? এই কাজটি না করলে বিগত ৭০ বছরেরও বেশি সময় ধরে জনগণ যেমন ঠকে এসেছেন, এবারও একইভাবে ঠকতে হবে। এই দল বিচারের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে তা এস ইউ সি আই (সি) জনগণের সামনে তুলে ধরেছে। তাকে গভীরভাবে চর্চা করতে হবে। এটাই আজ সময়ের দাবি।

শক্ত হল মালিকদের হাত

একের পাতার পর

যারা তিন মাসের মধ্যে বিষয়টি মীমাংসা করবেন। চুক্তিতে আপাতত ২০ হাজার শ্রমিককে স্থায়ী ও স্পেশাল বদলি করার কথা বলা হয়েছে, গ্রেড অ্যান্ড স্কেল নিয়ে কমিটি করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি শ্রমিককে নিয়োগপত্র দেওয়া, পি এফ, ই এস আইয়ের সুবিধা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার কথাও বলা হয়েছে। এই কয়েকটি বিষয় বাদ দিলে মূল সমস্যাগুলি সমাধানের কোনও উল্লেখ চুক্তিপত্রে নেই। এই অবস্থায় যখন জরুরি ছিল মালিকদের উপর চাপ বাড়িয়ে মূল দাবিগুলি ফয়সালায় নিয়ে যাওয়া, তখন সিটু এবং এ আই টি ইউ সি একক সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওয়াকআউট করে। এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠন আই এন টি ইউ সি, তৃণমূলের আই এন টি টি ইউ সি, বিজেপির বি এম এস সহ ১৪টি ইউনিয়ন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে।

তারপর সিটুর একক সিদ্ধান্তেই ১৫ মার্চ থেকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে একদিনের প্রতীকী ধর্মঘটে নামিয়ে আনা হয়। উভয়ক্ষেত্রেই সিটুর ভূমিকা মালিকদের সুবিধা করে দেয়। তাদের ভূমিকা শ্রমিক ঐক্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। এই ঘটনায় শ্রমিকরা হতাশ এবং বিভ্রান্ত। পুরনো শ্রমিকরা কিছুতেই ২ টাকা মজুরি বৃদ্ধি মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা ভুলতে পারেননি ২০০২ সালে সিপিএমের আমলে শ্রমিকদের মজুরি ১৭২ টাকা থেকে কমিয়ে দৈনিক ১০০ টাকা করা হয়েছিল। মজুরি কাটার সেই কালা চুক্তির ক্ষত আজও বহন করছেন শ্রমিকরা। মাত্র ২ টাকা মজুরি বৃদ্ধি সেই শ্রমিকদের ক্ষোভের আগুনে ঘি ঢেলেছে।

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত বেঙ্গল জুটমিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ১৪ মার্চ এক বিবৃতিতে শ্রমিকদের মূল সমস্যাগুলি সমাধানে শ্রমমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানান। সিটুর ভূমিকায় যে শ্রমিক ঐক্য ভেঙে গেল তা আবার ফিরিয়ে এনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর গ্রামীণ লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড নেপাল আচার্য

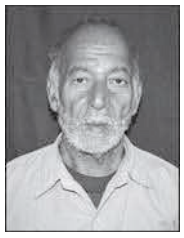

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৭ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। ১৯৭৬ সালের গোড়ার দিকে তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন এবং উত্তরোত্তর দলের সাথে নিজেকে ঘনিষ্ঠ করে তোলেন ও দলের আবেদনকারী সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। তিনি তাঁর সৎ, দায়িত্বশীল, শান্ত স্বভাবের মধ্য দিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলতেন, দলের চিন্তা নিয়ে যেতেন। তিনি দলের কাজ নিষ্ঠার সাথে পালন করার চেষ্টা করতেন। পরিবারের অভাব ও অসুস্থতা তাঁকে কখনও দলের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁর মৃত্যুতে দল এক নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল।

কমরেড নেপাল আচার্য লাল সেলাম

পূজালিতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাঁচানোর দাবি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ এলাকার পূজালি বিরাজলক্ষী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নতি এবং নিয়মিত বহির্বিভাগ চালু ও ২৪ ঘন্টা এমারজেন্সি চালু সহ জনস্বাস্থ্যের ৭ দফা দাবির ভিত্তিতে ৩ মার্চ পূজালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় নাগরিক কনভেনশন।

এই কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন প্রধান শিক্ষক নীলকান্ত ঘোষ। বক্তব্য রাখেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য ডাঃ কবিউল হক। কনভেনশনে বিশিষ্ট নাগরিক সহ বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। এই কনভেনশনে হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে 'পূজালি বিরাজলক্ষী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বাঁচাও কমিটি' গঠিত হয়।

নীলকান্ত ঘোষকে সভাপতি, সৌমেন বোধক ও গৌতম ঘোষকে সহ-সভাপতি, প্রতাপ খাঁড়া ও সুব্রত দাসকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৭ জনের সম্পাদকমন্ডলী নির্বাচিত হয়। এলাকার মানুষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে গণডেপুটেশন ও বিক্ষোভের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সোভিয়েত বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী প্রচার ও স্ট্যালিন

(ব্রিটেনের লেবার পার্টি সরকারের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী মিঃ মরিসনের একটি ঘোষণা সম্পর্কে স্ট্যালিনের জবাব ১৯৫১ সালে প্রথম 'প্রাভদা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বতন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির সংরক্ষণাগারে রক্ষিত দলিল থেকে জানা যায় যে, স্ট্যালিন রচনাবলির চতুর্দশ খণ্ডে এটি অন্তর্ভুক্ত করার কথা ছিল। অনেকেই জানেন, স্ট্যালিন রচনাবলির ১৩টি খণ্ড এ যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে সংশোধনবাদীরা ক্ষমতায় আসার পর স্ট্যালিনের আর কোনও রচনাই প্রকাশ করা হয়নি। ২০০২ সালে মস্কোর 'ইলেকট্রনিক পাবলিকেশন' এটি প্রকাশ করে, যার ইংরেজি তর্জমা দিল্লির 'রেভলিউশনারি ডেমোক্রেসি' পত্রিকা ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশ করেছে। ৫ মার্চ স্ট্যালিনের প্রয়াণ দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমরা তার বাংলা তর্জমা এখানে প্রকাশ করছি।)

সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতি সম্পর্কে মিঃ মরিসন দু'ভাগে কিছু প্রশ্ন তুলেছেন।

অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

মিঃ মরিসন জোরের সাথে বলেছেন, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সোভিয়েট ইউনিয়নে নেই।

মিঃ মরিসন এ ব্যাপারে গুরুতর ভুল করেছেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে যে রকম বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের ও ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে, শ্রমিক, চাষি ও বুদ্ধিজীবীদের যে রকম সংগঠন আছে, তা অন্য কোনও দেশে নেই। শ্রমিক ও চাষিদের জন্য যত সংখ্যায় ক্লাব সোভিয়েট ইউনিয়নে আছে, বিশেষ করে শুধু তাদেরই জন্য যত বেশি সংখ্যায় সংবাদপত্র আছে তা অন্য কোথাও নেই। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছাড়া অন্য কোথাও শ্রমিকশ্রেণিকে এমন সুসংবদ্ধভাবে সংগঠিত করা হয়নি। এ কথা কারও কাছেই গোপন নেই যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সমগ্র শ্রমিক শ্রেণি, আক্ষরিক অর্থে সমস্ত শ্রমিককেই ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত করা হয়েছে — যেমন সমস্ত চাষিদেরই কো-অপারেটিভগুলিতেসংগঠিত করা হয়েছে।

এ সত্য কি মিঃ মরিসন জানেন? তিনি অবশ্যই জানেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, এগুলি জানার কোনও ইচ্ছাও তাঁর নেই। রাশিয়ায় পুঁজিপতিদের যারা প্রতিনিধি, সোভিয়েট জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ীই যাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ তোলে, তাদের কাছ থেকেই জ্ঞান আহরণ করতে মিঃ মরিসন পছন্দ করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নে বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্র চালাবার বা সংগঠন করার স্বাধীনতা নেই কেবলমাত্র জনগণের শত্রুদের এবং ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের, যাদের বিপ্লবের দ্বারা ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। একইভাবে যারা হাড়ে-মজ্জায় চোর, যারা অন্তর্ঘাতক, সন্ত্রাসবাদী, খুনি এবং ক্রিমিনাল— তাদের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নে কোনও স্বাধীনতা নেই। এরাই লেনিনকে গুলি করেছিল, ভোলোদারস্কি, উরিস্টস্কি, কিরভকে হত্যা করেছিল, ম্যাক্সিম গোর্কি ও কুইবিসেভকে বিষ প্রয়োগ করেছিল— এ ধরনের সমস্ত ক্রিমিনাল, ভূস্বামী ও পুঁজিপতিদের থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদী চোর, খুনি এবং যারা অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত এদের সকলের একটিই উদ্দেশ্য, এরা সকলেই সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদকে আবার ফিরিয়ে আনতে চায়, মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায় এবং গোটা দেশে শ্রমিক-চাষির রক্তের বন্যা বইয়ে দিতে চায়। বন্দিশালা ও লেবার ক্যাম্পগুলি রয়েছে এইসব ভদ্রমহোদয়দের জন্য এবং কেবল তাদেরই জন্য।

মিঃ মরিসন কি এসব লোকেদের জন্যই বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন? মিঃ মরিসন কি সত্যিই মনে করেন যে, এসব লোকেদের জন্য বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে অর্থাৎ শ্রমিকদের শোষণ করার স্বাধীনতা দিতে সোভিয়েট জনগণ রাজি হবে?

মিঃ মরিসন কিন্তু অন্য ধরনের স্বাধীনতা— যার তাৎপর্য বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদির চেয়েও অনেক গভীরে— সে বিষয়ে নীরব রয়েছেন। শোষণের জোয়াল থেকে জনগণের স্বাধীন হওয়া, অর্থনৈতিক সংকট, বেকারি, দারিদ্র্য থেকে জনগণের স্বাধীন হওয়া সম্পর্কে তিনি কিছুই বলেননি। সোভিয়েট ইউনিয়নে এইসব স্বাধীনতা যে দীর্ঘকাল ধরে বিরাজ করছে, মিঃ মরিসন সম্ভবত তা জানেন না। অথচ ঠিক এইসব স্বাধীনতাগুলিই হচ্ছে অন্য সকল স্বাধীনতার বনিয়াদ। এজন্যই কি মিঃ মরিসন এসব বনিয়াদি স্বাধীনতাগুলি সম্পর্কে মুখ খুলতে লজ্জা পাচ্ছেন— যেহেতু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ইংল্যান্ডে এসব স্বাধীনতার অস্তিত্ব নেই এবং লেবার পার্টি গত ছ'বছর ধরে ইংল্যান্ডের ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও সেখানকার শ্রমিক শ্রেণি আজও শোষক পুঁজিপতিদের দাসত্ব করে যাচ্ছে।

মিঃ মরিসন জোর দিয়ে বলেছেন, লেবার পার্টির সরকার একটি সমাজতান্ত্রিক সরকার। ফলে এ ধরনের একটি সরকারের নিয়ন্ত্রণে যে রেডিও সম্প্রচারগুলি করা হয়, সোভিয়েটের দিক থেকে তাতে বাধা আসা উচিত নয়।

দুঃখের কথা, এ ব্যাপারে মিঃ মরিসনের সাথে আমরা একমত হতে পারছি না। লেবার পার্টি প্রথম যখন ক্ষমতায় এসেছিল, তখন কেউ ভেবে থাকতে পারে যে, এই সরকার সমাজতন্ত্রের পথ অনুসরণ করবে। কালক্রমে দেখা গেল, যে কোনও বুর্জোয়া সরকারের সাথে কোনও পার্থক্যই নেই লেবার সরকারের। এই সরকারেরও লক্ষ্য পুঁজিবাদী কাঠামোকেই টিকিয়ে রাখা ও পুঁজিপতিদের জন্য বিস্তর মুনাফা লোটার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

বাস্তবে, ইংল্যান্ডে পুঁজিপতিদের মুনাফা বছর বছর বাড়ছে, কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি এক জায়গায় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তদুপরি, এই শ্রমিক-বিরোধী, শোষণমূলক শাসনব্যবস্থাকেই লেবার সরকার রক্ষা করছে। সেজন্য নানা ব্যবস্থা নিচ্ছে, শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন চালাচ্ছে, এমনকী তাদের গ্রেপ্তার করছে। এমন একটি সরকারকে সমাজতান্ত্রিক বলা যায় কি?

কেউ ভেবে থাকতে পারে যে, লেবার সরকার যখন ক্ষমতায়, তখন পুঁজিবাদী শোষণ নির্মূল হবে, সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম নিয়ম করে কমানো হবে এবং শ্রমিকদের অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটানো হবে। উল্টে আমরা দেখছি, ইংল্যান্ডে পুঁজিপতিদের মুনাফা বাড়ছে, শ্রমিকদের মজুরি বেঁধে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের নিত্য ব্যবহার্য পণ্যগুলির দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। না, এ ধরনের রাজনীতিকে আমরা সমাজতান্ত্রিক বলতে পারি না। সোভিয়েট ইউনিয়নকে লক্ষ্য করে ইংল্যান্ড থেকে পরিচালিত রেডিও সম্প্রচার (বিবিসি) সম্পর্কে বলতে হয়, জনগণের যে শত্রুরা সোভিয়েট ইউনিয়নে পুঁজিবাদী শোষণ ফিরিয়ে আনার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে, প্রধানত তাদের মদত দিতেই ওই সম্প্রচারগুলি করা হয় এবং এটা সকলেই জানেন। এটা বোঝাই যায় যে, এইসব জনস্বার্থবিরোধী প্রচার, যা বাস্তবিকপক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপেরই সামিল, তাকে সোভিয়েট সরকার সমর্থন করতে পারে না। মিঃ মরিসন বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে সোভিয়েটের ক্ষমতা হচ্ছে একটি মনোলিথিক ক্ষমতা, কারণ, তা কেবলমাত্র একটি পার্টিরই ক্ষমতার প্রতিনিধিত্ব করে, সেটি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। একই যুক্তিতে আমরাও বলতে পারি, ইংল্যান্ডের লেবার সরকারও একটি মনোলিথিক সরকার, যেহেতু এই সরকারও একটি পার্টিরই, অর্থাৎ একমাত্র লেবার পার্টিরই প্রতিনিধিত্ব করে।

মূল কথা অবশ্য এটা নয়। এখানে মূল কথা হল, সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্টরা, প্রথমত স্বতন্ত্রভাবে একাকী কাজ করে না, পার্টির বাইরের মানুষদের (নন-পার্টি পিপল) সাথে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐতিহাসিক বিকাশে কমিউনিস্ট পার্টিই নিজেকে একমাত্র পুঁজিবাদবিরোধী পার্টি, জনগণের পার্টি রূপে প্রমাণ করেছে।

গত ৫০ বছর ধরে রাশিয়ায় যেসব প্রধান প্রধান পার্টি ছিল, রাশিয়ার জনগণ তাদের সকলকেই দেখেছে ঃ ভূস্বামীদের পার্টি (দি ব্ল্যাক হান্ড্রেডস), পুঁজিপতিদের পার্টি (দি ক্যাডেটস), মেনশেভিক পার্টি (দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রী), দি পার্টি অফ দি সোস্যাল রেভলিউশনারিজ (কুলাকদের রক্ষক), কমিউনিস্ট পার্টি। বিপ্লবী আন্দোলনের গতিপথে আমাদের জনগণ সকল বুর্জোয়া পার্টিকে বর্জন করেছে এবং পছন্দ করেছে কমিউনিস্টদেরই— যেহেতু তারা দেখেছে একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই ভূস্বামী বিরোধী ও পুঁজিবাদবিরোধী পার্টি। এটা একটা বাস্তব ঘটনা এবং বোঝাই যায় যে, কমিউনিস্ট পার্টি যে সংগ্রাম করেছে, তাকে সোভিয়েট জনগণ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেছে।

এই বাস্তব ঘটনাকে মিঃ মরিসন কী দিয়ে নস্যাৎ করবেন? তিনি কি মনে করেন, বিরোধীদের সন্দেহজনক মতলব চরিতার্থ করার প্রয়োজনে কেউ চাইলেই ইতিহাসের চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে এবং যেসব পার্টি দীর্ঘকাল আগে শেষ হয়ে গিয়েছে, তাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারে?

বৈদেশিক রাজনীতি

মিঃ মরিসন দাবি করেছেন, লেবার সরকার শান্তি বজায় রাখার পক্ষে, তাদের দিক থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নের কোনও আশঙ্কা নেই। নর্থ আটলান্টিক চুক্তি যুদ্ধের জন্য সামরিক বাহিনী তৈরির উদ্দেশ্যে হলেও এটি একটি অনাক্রমণ চুক্তি। ইংল্যান্ড অস্ত্র প্রতিযোগিতার পথে নামতে বাধ্য হয়েছে, কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সেনাবাহিনীর আকার যথেষ্ট পরিমাণে কমায়নি।

মিঃ মরিসনের এইসব দাবিগুলির মধ্যে দুঃখের বিষয় এক বিন্দুও সত্য নেই।

লেবার সরকার যদি প্রকৃতই শান্তির পক্ষে হয়, তাহলে কেন তারা পাঁচটি রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি এড়িয়ে যাচ্ছে? কেন তারা সকল বৃহৎ শক্তির অস্ত্র হ্রাসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করছে? কেন তারা পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে বলছে? শান্তির পক্ষে যারা দাঁড়াচ্ছে কেন লেবার সরকার তাদের উৎপীড়ন করছে? ইংল্যান্ডে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য যে পরিকল্পিত প্রচার চালানো হচ্ছে, কেন তারা সেই প্রচার নিষিদ্ধ করছে না?

মিঃ মরিসন চাইছেন আমরা যেন তাঁর মুখের কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু সোভিয়েট জনগণ কারোরই— তিনি যেই হোন না কেন— মুখের কথায় বিশ্বাস করে না। তারা মৌখিক ঘোষণা নয়, বাস্তবে কাজ দাবি করে।

একইভাবে মিঃ মরিসন যে বলেছেন— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েট ইউনিয়ন তার সেনাবাহিনীর আকার যথেষ্ট পরিমাণে কমায়নি, সেটাও ধোপে টেকে না। সোভিয়েট সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে যে, সেনাবাহিনীর আকার কমানো হয়েছে এবং বর্তমানে সোভিয়েট সেনাবাহিনীর আকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার শান্তির সময়ের মতোই প্রায়। অন্য দিকে, ইংল্যান্ডের বর্তমান সেনাবাহিনীর আকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার চেয়ে দ্বিগুণ বেশি। এই হচ্ছে বাস্তব তথ্য যা অস্বীকার করার উপায় নেই, অথচ এর বিরোধিতা করা হচ্ছে ভিত্তিহীন অমূলক বিবৃতি দিয়ে।

মিঃ মরিসন হয়তো চাইছেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন এমন সেনাবাহিনী রাখুক, যাদের অস্ত্রেরই কোনও প্রয়োজন নেই। বাস্তবে সেনাবাহিনীর পিছনেই সরকারি বাজেটের মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় হয়ে যায়, এবং সোভিয়েট জনগণ খুশি মনেই নিয়মিত সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়ার পক্ষে মত দেবে, যদি বাইরের থেকে আক্রমণের আশঙ্কা না থাকে। কিন্তু ১৯১৮-২০ সালের অভিজ্ঞতা আমাদের অন্য রকম শিক্ষা দিয়েছে। তখন ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স (জাপানের সাথে যুক্ত হয়ে) সোভিয়েট ইউনিয়নকে আক্রমণ করেছিল এবং ইউক্রেন, ককেশাস, মধ্য এশিয়া, দূর প্রাচ্য ও আরখানজেলস্কি অঞ্চল ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল, তিন বছর ধরে আমাদের কষ্ট দিয়েছিল। এই ঘটনা আমাদের শিখিয়েছে, সোভিয়েট ইউনিয়নকে অবশ্যই ন্যূনতম প্রায়োজনীয় আকারে নিয়মিত সেনাবাহিনী বজায় রাখতে হবে, যাতে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনকারীদের হাত থেকে

সাতের পাতায় দেখুন

মদ ঃ গোটা রাজ্যে বিক্ষোভে ফেটে পড়ল মানুষ

মদের প্রভাবে বেড়ে চলেছে অসামাজিক কাজ। চুরি-ডাকাতি, মহিলাদের উপর অত্যাচার ছাড়াও নেশার টাকার জন্য বাবাকে খুন করছে ছেলে, মাকে ধরে পেটাচ্ছে। সর্বত্র চলছে মদ্যপদের দৌরাত্ম্য। সরকার এর কোনও প্রতিকার না করে উৎসাহ দিয়ে চলেছে মদ্যপানে। দিয়ে চলেছে একের পর এক দোকানের ঢালাও লাইসেন্স।

জলপাইগুড়ি

সিউড়ি। বীরভূম

এইরকম পরিস্থিতিতে ১৫ মার্চ রাজ্যের সর্বত্র মদবিরোধী বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। কোথাও আবগারি দপ্তরে, কোথাও ডিএম-এসডিও দপ্তরে বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষ। তাদের জীবনের অন্যান্য জ্বালা-যন্ত্রণার সাথেই এর ভয়াবহ বিপদ বুঝে মহিলারাই বেশি সামিল হয়েছিলেন বিক্ষোভ মিছিলে।

কলকাতা

কলকাতার বৌবাজার ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া মোড় থেকে সহস্রাধিক মানুষ মিছিল করে আবগারি দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে যান। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে আবগারি দপ্তরের বেশ কিছুটা আগেই পুলিশ মিছিলের পথ আটকালে সেখানে বিক্ষোভকারীদের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। পরে ওখান থেকে এস ইউ সি আই (সি)-র এক প্রতিনিধি দল আবগারি দপ্তরের অফিসারের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

ওই দিন দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা সদর বারুইপুরে এসডিও দপ্তরে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখান (ছবি প্রথম পাতায়)। বাঁকুড়ার এসডিও দপ্তরে ও আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ হয়। জেলার খাতড়া ও ছাতনা, হিড়বাঁধ, বিষ্ণুপুর, সোনামুখীতেও বিক্ষোভ হয়। জলপাইগুড়ি সদর ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ধূপগুড়ি বিডিওতেও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মিছিল করে শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে আবগারি দপ্তরের আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নদীয়া জেলার তেহট্ট, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, দেবগ্রাম, পলশুণ্ডায় আবগারি দপ্তর ও প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। বীরভূমের সিউড়িতে ডি এম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান তিন শতাধিক মানুষ। অন্যান্য জেলাতেও বিক্ষোভ-ডেপুটেশন হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর

আসামে চোলাই মদে মৃত দুই শতাধিক। মদ নিষিদ্ধ করার দাবিতে ৯ মার্চ গুয়াহাটিতে বিক্ষোভ

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের ক্ষতিপূরণ ও কৃষিঋণ মকুবের দাবিতে বিক্ষোভ

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে অন্যান্য জেলার মতো বর্ধমানেও বেশিরভাগ আলুখেতের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় পিঁয়াজ ও অন্যান্য আনাজ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী আলুর ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর জমি। বেশিরভাগ পচে যাওয়া আলুর যেটুকু বাঁচবে তা হবে নিম্নমানের। রাজ্য সরকার এখনও ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেনি। সরকার উৎপাদিত আলুর মাত্র ১৫ শতাংশ কেনার কথা বলেছে। চাষের সময় যে ঋণ নিয়ে কৃষক চাষ করেছে এই ক্ষতির ফলে সেই ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। সরকার যদি এখনই কৃষি ঋণ মকুব ও ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা না করে, কৃষক আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হবেন। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই (সি) পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটি বিঘা প্রতি ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ, কৃষি ঋণ মকুব, আলুর সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি সহ ৭ দফা দাবিতে জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেন (ছবি)। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড অনিরুদ্ধ কুণ্ডু।

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ গড়বেতা, কেশপুর, শালবনি, মেদিনীপুরের সদর ব্লক সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কৃষকরা ৫ মার্চ আলু চাষের ক্ষতিপূরণের দাবিতে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। এদিন মেদিনীপুর স্টেশন থেকে একটি মিছিল কেরানিতোলা, বটতলা, কলেজ রোড হয়ে কালেক্টরেট মোড়ে পৌঁছে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। এস ইউ সি আই (সি) র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তুষার জানা, কৃষক নেতা কমরেড প্রভঞ্জন জানা মিছিলের নেতৃত্ব দেন। দাবি ওঠে অবিলম্বে সরকারিভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, কুইন্টাল প্রতি আটশো টাকা দরে আলু কিনতে হবে, এ ছাড়াও অন্যান্য সব্জির যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ অবিলম্বে সরকারকে দিতে হবে। পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল ডি এম দপ্তরে দাবিপত্র পেশ করে।

ত্রিপুরা এআইএমএসএস-এর স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে

সারা দেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন আবাসনে অসহায় মহিলা ও শিশুদের উপর শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতন বেড়েই চলেছে। এসব বন্ধ করার দাবিতে প্রতিটি রাজ্য থেকে রাজ্যপাল মারফত প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পাঠানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। তারই অঙ্গ হিসাবে ৪ মার্চ সংগঠনের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির নেতৃবৃন্দ রাজভবনে রাজ্যপালের সাথে দেখা করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি তুলে দেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভানেত্রী শিবানী ভৌমিক, সম্পাদিকা শুক্লা চক্রবর্তী সহ ৭ জন প্রতিনিধি।

সংগঠনের দাবি, আবাসন কেন্দ্রগুলি নির্ধারিত নিয়ম মেনে পরিচালিত হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হবে, অনাথ আশ্রমগুলি সম্পূর্ণরূপে সরকারি উদ্যোগে ও নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, আবাসনগুলিতে উচ্চ নীতি-নৈতিকতা সম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে, স্বচ্ছতা ও প্রয়োজনীয় তথ্যের রেকর্ড রাখতে হবে, আবাসনে বসবাসকারীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার পরিবেশ রক্ষা করা এবং চিকিৎসা ও মনস্তাত্ত্বিক সাহায্য প্রদান করতে হবে, আবাসনগুলি দেখভাল করার জন্য উপযুক্ত আধিকারিক নিয়োগ করতে হবে, আবাসিকদের উপর অত্যাচারীদের কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি— প্রয়োজনে পকসো আইন প্রয়োগ করতে হবে।

উত্তরবঙ্গ জুড়ে দেওয়াল লিখন সহ প্রচারের কাজে নেমে পড়েছেন কর্মীরা

▲ কোচবিহার

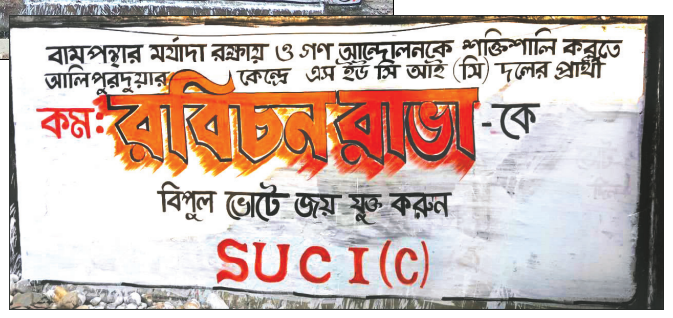

আলিপুরদুয়ার ➤

আর্সেনিক আক্রান্তদের চিকিৎসার দাবিতে গাইঘাটায় বিক্ষোভ

ভোট আসে, ভোট যায়। সরকারও পাল্টায়। কিন্তু আর্সেনিক আক্রান্তদের জীবনের সমস্যার সমাধান হয় না। রাজ্যের ১০৯টি আর্সেনিক আক্রান্ত ব্লকের মধ্যে উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা ব্লক অন্যতম। এই ব্লকের সুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বিষ্ণুপুর মাঠপাড়ায় গত ১০ মার্চ আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় মারা যান বিশ্বনাথ দাস, ১১ মার্চ মারা যান বলরাম দাস এবং ১২ মার্চ ভোরে বলরাম দাসের স্ত্রী বিমলা দাস। বিগত কয়েক বছরে গাইঘাটা ব্লকে প্রায় ৩৪ জন মারা গেছেন। এ যেন মৃত্যুর মিছিল।

আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল, আর্সেনিক আক্রান্তদের চিহ্নিতকরণ ও সুচিকিৎসা এবং আর্সেনিকোসিসে মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য সহ ৭ দফা দাবিতে ১২ মার্চ গাইঘাটা ব্লক অফিসে বিক্ষোভ দেখায় আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটি। বিক্ষোভ চলাকালীন আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির রাজ্য সম্পাদক অশোক দাসের নেতৃত্বে স্বপন গোস্বামী, রূপম ভৌমিক, সঞ্জীব চ্যাটার্জী ও বিষ্ণুপুরের আর্সেনিক আক্রান্ত রোগী জগবন্ধু মন্ডল জয়েন্ট বিডিও-র সাথে দেখা করে স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপির সাথে পিএইচইডি সরবরাহকৃত নলবাহিত জল, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের জল যাতে মিড-ডে মিল রান্না হয় এবং আর্সেনিক মুক্ত বলে পরিচিত নলকূপের জলের আর্সেনিক পরীক্ষার রিপোর্ট দেওয়া হয়। হু-এর মতে প্রতি লিটার জলে আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা ০.০১ মিলি গ্রাম। সেখানে দেখা যায় যে, গাইঘাটা ও ঠাকুরনগরের পিএইচইডি সরবরাহকৃত জলে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া গাইঘাটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ অন্যান্য আর্সেনিক মুক্ত বলে পরিচিত নলকূপের জলেও মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক পাওয়া গেছে। বহু বিদ্যালয়ের জলেও মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক মিলেছে।

ফলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী না জেনে ওই বিষ জল পান করছে এবং ওই বিষ জলে রান্না হওয়া মিড-ডে মিলের খাবার খাচ্ছে। আলোচনায় জয়েন্ট বিডিও কথা দিতে বাধ্য হন যে, আর্সেনিক যুক্ত নলকূপগুলি অবিলম্বে বন্ধ করার ব্যবস্থা তিনি করবেন। তিনি আরও কথা দেন যে, দরিদ্র আর্সেনিক আক্রান্তরা সাহায্যের আবেদন করলে তিনি তার ব্যবস্থা করবেন।

আন্দোলনের চাপে পরের দিনই (১৩ মার্চ) গাইঘাটা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ভিক্টর সাহা মেডিক্যাল টিম নিয়ে বিষ্ণুপুরের মৃত পরিবার সহ আর্সেনিক আক্রান্তদের বাড়ি বাড়ি যান। পরিদর্শনের সময় আর্সেনিক দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে আর্সেনিক রোগীদের জন্য স্পেশাল মেডিক্যাল ক্যাম্পের দাবি জানানো হয়। ডাঃ সাহা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

অবিলম্বে আর্সেনিক দূষিত অঞ্চলগুলিতে আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহ ও আর্সেনিক আক্রান্তদের সুচিকিৎসা এবং পুষ্টিকর ও ভিটামিন যুক্ত খাবার দেওয়া যদি না হয়, তবে মৃত্যুর মিছিল আরও দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হবে।

সন্ত্রাসীর কোনও ধর্ম বা বর্ণ নেই

একের পাতার পর

ইউরোপ-আমেরিকা জুড়ে ইসলাম বিদ্বেষের ঢেউ তোলা হয়েছে। এশিয়া-আফ্রিকার গৃহযুদ্ধ-সন্ত্রাস বিদীর্ণ ভূখণ্ড থেকে বাঁচার আশায় ইউরোপে আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থীদের বিরুদ্ধে উগ্রজাতীয়তাবাদকে চাগিয়ে তোলা হচ্ছে সর্বত্র। আমেরিকার ৯/১১ হামলার পর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আপনারা হয় আমাদের সঙ্গে, নয় তো সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে।" অর্থাৎ আমেরিকার পক্ষে কেউ না থাকলেই সে সন্ত্রাসবাদী। সেই বুশেরই যোগ্য উত্তরসূরী ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প মেক্সিকান অভিবাসীদের সম্পর্কে বলেছেন, "শুনতে খারাপ লাগলেও ওরা হানাদারই। সব ধরনের অপরাধী ঢুকছে দক্ষিণের সীমান্ত দিয়ে।" এই ট্রাম্পই 'অভিবাসীদের আড়ালে দুষ্কৃতী ঢুকবে' এই অজুহাতে সাতটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের আমেরিকায় ঢোকা নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। ৯/১১-র টুইন টাওয়ার হামলার পর আমেরিকা এর পুরো দায় ইসলাম ও ১৩০ কোটি মুসলমানের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। এই ভাবেই আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি জাতিবিদ্বেষকে ছড়িয়ে দিয়েছে দেশে দেশে। বিশ্বজুড়ে সংগঠিত সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসও তাই। সবগুলির পিছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ শিরোমণি আমেরিকা এবং অন্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষ মদত। ইতিহাস বলছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই আফগানিস্তানে সোভিয়েতের প্রভাব মোকাবিলার জন্য গঠন করেছিল আল কায়দা ও তালিবানদের, জন্ম দিয়েছিল ওসামা বিন লাদেনের মতো মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের। এই আলকায়দা ও তালিবানকেই মার্কিনীরা পরবর্তীকালে ব্যবহার করে সন্ত্রাস ও ইসলামকে সমার্থক করে তোলে। আবার সেই সন্ত্রাসকে ব্যাপক প্রচার দিয়ে তাকে গুরুতর শত্রু হিসাবে তুলে ধরে তাকে দমনের নামে দেশে দেশে হামলা চালানোর এবং সে দেশগুলির সম্পদ দখলের সুযোগ করে নেয় তারা।

পুঁজিবাদ আজ চরম সংকটগ্রস্ত, মানুষকে দেওয়ার মতো তার আর কিছুই নেই, বরং সংকট থেকে বাঁচতে সংকটের সমস্ত বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা বাঁচতে চাইছে। ফল হিসাবে বিশ্বজুড়ে দেশে দেশে প্রবল বিক্ষোভে সাধারণ মানুষ ফেটে পড়ছে। সেই বিক্ষোভ যাতে নিজ নিজ দেশের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামের আকারে ফেটে পড়তে না পারে, যাতে সমস্ত সংকটের জন্য দায়ী পুঁজিবাদকে মানুষের বিক্ষোভের আগুন থেকে আড়াল করা যায়, তাই পরিকল্পিত ভাবে 'সন্ত্রাসবাদের' জন্ম দিয়েছে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি এবং এই ভাবে পুঁজিবাদী শোষণকে আড়াল করে সন্ত্রাসবাদকেই প্রধান সমস্যা হিসাবে তুলে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। একই ভাবে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে নৈরাজ্য সৃষ্টির ষড়যন্ত্র সফল করতে আমেরিকা ও তার স্যাঙাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একদিকে নানা ভাবে আই এস-এর মতো নানা উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী গড়ে ওঠার সুযোগ করে দিচ্ছে, অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে তাদের বাড়বাড়ন্তে সাহায্য করে চলেছে।

দি ডেইলি টেলিগ্রাফ, ১২ জুন ২০১৪ তারিখে লিখেছিল, 'আরব বসন্ত' সিরিয়ায় এসে ধাক্কা খাওয়া মেনে নিতে পারেননি মার্কিন নেতারা। একই ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক ও রাজতন্ত্রশাসিত আরবের দেশগুলো সিরিয়ার সরকারকে উৎখাতের জন্য পরিচালিত জেহাদে বিপুল অর্থ জুগিয়েছে। এই অর্থের সবচেয়ে বড় ভাগ একসময় পেয়েছে আই এস।

একই রকম ভাবে শরণার্থীদের বিরুদ্ধে ইউরোপ এবং আমেরিকা জুড়ে যে বিদ্বেষ ফেটে পড়ছে সেই বিদ্বেষের জন্মদাতাও সাম্রাজ্যবাদীরা। একদিকে মার্কিন দখলদারির নীতির ফলেই মধ্য প্রাচ্য এবং আফ্রিকার দেশগুলিতে চরম নৈরাজ্য তৈরি হয়েছে। যুদ্ধ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, মৃত্যু সেখানকার জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজতে পাড়ি দিচ্ছে অজানা পথে। অন্য দিকে সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের মতোই আমেরিকাতেও অর্থনৈতিক মন্দা, বেকার সমস্যা, জীবনযাপনের ব্যয় বৃদ্ধি এমন চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে যে, মানুষের বিক্ষোভ সেখানে ফেটে ফেটে বেরোতে চাইছে। 'অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট' মুভমেন্ট তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাস্থ্য-শিক্ষা সহ অনেক মৌলিক অধিকারই আজ আমেরিকাবাসীদের নাগালের বাইরে। এই বিক্ষোভ ঠেকানো ও শোষিত মানুষকে বিভক্ত করার জন্য একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ট্রাম্পের মতো এক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিকে জিতিয়ে এনেছে। ট্রাম্প দেখালেন, আমেরিকানদের বেকারত্বের কারণ পুঁজিবাদ নয়, অভিবাসীরা। তাদের জন্যই শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানরা কাজ পাচ্ছে না। এই উগ্র আমেরিকান জাতীয়তাবাদ প্রচার করে তিনি আমেরিকায় বসবাসকারী বিভিন্ন দেশের বিরাট সংখ্যক অভিবাসীদের বিরুদ্ধে, এরই সাথে সাথে কালোদের বিরুদ্ধে, হিস্পানিকদের (আমেরিকায় বসবাসকারী স্প্যানিশ ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী) বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের খেপিয়ে তুললেন। এক কথায় মানুষের পিছিয়ে পড়া চিন্তাকে ভয়ানক মাত্রায় উত্তেজিত করেই ট্রাম্পের আগমন। আমেরিকার সমস্ত রকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকটের মূল যে সেখানকার সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ, এর দ্বারা সেটাই পিছনে চলে গেল। এরই ফলে ফ্যাসিস্ট এবং বর্ণ বৈষম্যবাদী শক্তিগুলি মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রত্যক্ষ সমর্থনে নতুন করে মাথা তুলছে আমেরিকা জুড়ে।

এই উগ্র জাত্যাভিমানকে ইউরোপের শাসক শ্রেণির একাংশও মদত দিয়ে চলেছে। তাই ইউরোপ জুড়েও জাতিবাদী ও ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলি আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। যুব সমাজের একাংশের মধ্যে এর প্রভাব পড়ছে। বেন্টন ট্যারান্ট তেমনই এক যুবক। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, সে ট্রাম্পকে তার গুরু মেনেছে।

গোটা বিশ্বের মতো ভারতের শাসক শ্রেণিও পুঁজিবাদী সংকটের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে বিপথগামী করতে একই ভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, উগ্র জাতীয়তাবাদের বীজ বুনছে। শোষিত মানুষের মধ্যে ঐক্যকে ধ্বংস করতে ঘৃণা ছড়াচ্ছে। ইসলাম এবং খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উপর নানা আক্রমণ নামিয়ে আনছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে এখানে খুবই মিল। তাই ট্রাম্প বিজেপি-সংঘ পরিবারের খুবই প্রিয়পাত্র। অথচ কাজের খোঁজে ভারতীয়রা পৌঁছায়নি এমন কোনও দেশ নেই। বিজেপি নেতারা একবারও ভেবে দেখেন না, তাঁদের জাতিবাদী কার্যকলাপ অন্য দেশে কর্মরত লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের একই বিপদে ফেলতে পারে।

আশার কথা, বিশ্বের দেশে দেশে শুভবুদ্ধির মানুষ এই সন্ত্রাসবাদী হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। তীব্র নিন্দা করেছেন এই হত্যাকাণ্ডের। ভারতে একটি সন্ত্রাসী হামলাকে সামনে রেখে যখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গোরা ভোটের বাজার গরম করতে প্রতিবেশী দেশের সাথে সংঘর্ষের মনোভাবে উস্কানি দিচ্ছেন, যুদ্ধ যুদ্ধ পরিবেশ গড়ে তুলতে চাইছেন তখন নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী দেশের সব ধর্মের সব বর্ণের মানুষের মধ্যে ঐক্য-প্রচেষ্টার এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। মুসলিম এবং অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষকে কোনও রকম প্রশ্রয় না দিয়ে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডের্ন আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ালেন। এই হামলাকে 'নিউজিল্যান্ডের ইতিহাসে অন্ধকারময় দিন' হিসাবে চিহ্নিত করে বললেন, "যাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন তাঁরাই আমরা। এ দেশকে নিরাপদ বাসভূমি হিসাবে যাঁরা বেছে নিয়েছেন, নিউজিল্যান্ড তাঁদেরই। যে হামলা চালিয়েছে সে আমাদের কেউ নয়।" উগ্রজাতিবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে এই প্রচেষ্টাকেই দেশে দেশে শক্তিশালী করতে হবে।

মোটরভ্যান শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

২ মার্চ দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর তরুণ সংঘ সভাঘরে মোটরভ্যান শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এআইইউটিইউসি-র আহ্বানে মালদা এবং দুই দিনাজপুর থেকে মোট ১৭৫ জন মোটরভ্যান শ্রমিক এই শিবিরে যোগ দেন। তাঁদের নানা প্রশ্ন এবং শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, ভোটসর্বস্ব রাজনীতির কুফল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের পূর্বতন রাজ্য সহসভাপতি কমরেড গোপাল নন্দী এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস। শিক্ষাশিবিরে মূল আলোচনা করেন সংগঠনের বর্তমান রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা।

পাঠকের মতামত

ভোটের জন্যই যুদ্ধ-জিগির

কাশ্মীরের পুলওয়ামায় ৪০ জন সি আর পি এফ জওয়ান জঙ্গি হামলায় নিহত হওয়ার খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পর থেকেই গোটা দেশ জুড়ে একটা যুদ্ধোন্মাদনা চাগিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। কি ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বা প্রিন্ট মিডিয়া, সবেতেই একটা আলোচনা 'এই যুদ্ধ লাগল বলে'! আর সীমান্তে যুদ্ধের উত্তাপ ছড়াক বা না ছড়াক তার চেয়ে বেশি 'যুদ্ধং দেহি' উত্তাপ সোস্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলিতে। ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস অ্যাপ— সর্বত্র অন্ধ পাকিস্তান বিরোধী প্রচার।

উল্টো ছবিও আছে। প্রশ্ন উঠছে, যে দেশের প্রধানমন্ত্রী '৫৬ ইঞ্চি ছাতি' ফুলিয়ে 'তাল ঠোকেন' সেই প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীর উপর হামলা হতে পারে এমন সতর্কতামূলক খবর থাকা সত্ত্বেও আগাম কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন না কেন? যারা দেশের নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত এবং প্রত্যেক বছর যাদের উন্নয়নের কথা বলে সরকার মোট বাজেটের বৃহৎ অংশ ব্যয় করে, তাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারের এতটুকু হেলদোল নেই কেন? যে রাস্তা দিয়ে সেদিন সেনা গিয়েছিল তা নাকি নিরাপত্তার দিক থেকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর অঞ্চল! সেই রকম একটি অঞ্চলে ৩৫০ কেজি আর ডি এক্স নিয়ে একটি গাড়ি নিরাপত্তার বেড়াজাল টপকে ঢুকে পড়ল কীভাবে? আর এই প্রশ্নগুলি তুললেই তাদের দেশদ্রোহী বলা হচ্ছে কোন যুক্তিতে?

পুলওয়ামার ঘটনার ১২ দিন পরে দেশের বিমানবাহিনী ১২টি মিগ-২১ যুদ্ধ বিমান সহযোগে পাকিস্তানের বালাকোটে হামলা চালাল। ভারতীয় মিডিয়া এক নাগাড়ে প্রচার করে গেল, 'ভারতীয় বিমান বাহিনীর হামলায় ৩৫০ জন জঙ্গি খতম হয়েছে'। কিন্তু তার স্বপক্ষে কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ সরকারের তরফে পেশ করা হল না।

আন্তর্জাতিক মিডিয়া ভারতীয় মিডিয়ার দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল যে ভারতীয় বিমানবাহিনীর হামলায় ক্ষতি হয়েছে ১৫টা পাইন গাছ, আর মরেছে ১টি মাত্র কাক! তখন সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা নিজেদের মুখ ঢাকতে পরস্পর বিরোধী মন্তব্য শুরু করে দিলেন। তা হলে সত্য কোনটা? প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে সত্য বলছেন না কেন? দেশের সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। পাঁচ বছর পূর্বে প্রতিশ্রুতির যে ডালা সাজিয়ে সরকারি ক্ষমতায় বসেছিল বর্তমান শাসকদল তা পুরোটাই যে 'ভাঁওতা' তা এখন জলের মতো পরিষ্কার। ফলে সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা যখন নির্বাচনের প্রাক্কালে জনগণের দুয়ারে ভোট ভিক্ষে করতে যাবেন এখন তো তাদেরকে জনগণের 'তেতো বড়ি' মার্কা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। ফলে সেটা যাতে না ঘটে তার জন্যই কি যুদ্ধ যুদ্ধ জিগির তোলা?

সৌপ্তিক পাল

কলকাতা

আলু চাষিদের সাথে সরকারি প্রতারণা চলছেই

বিষের শিশি হাতে নিয়ে রাস্তায় আলু ফেলে বিক্ষোভ দেখালেন পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরের আলু চাষিরা। ফসলের দাম না পাওয়া ও দুর্যোগের কারণে ক্ষতিপূরণ চেয়ে মেদিনীপুর-চন্দ্রকোনা রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। হুগলির চাষিরাও বিক্ষোভে সামিল।

দেশজুড়ে চাষিরা যে চূড়ান্ত সংকটের সম্মুখীন তা কারও অজানা নয়। ফসলের দাম না পেয়ে ঋণগ্রস্ত চাষিদের আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার খবর প্রায় প্রতিদিনই সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে।

চলতি বছরে এ রাজ্যে আলুচাষিরা ইতিমধ্যেই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ভাল ফলন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে। এ বছর যে আলুর ফলন ভাল হবে তা জানাই ছিল। গত বছর এ রাজ্যে আলুর ফলন হয়েছিল ১ কোটি মেট্রিক টন, যা এ বছর বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৭০ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়াবে বলে জানিয়েছে বিশেষজ্ঞরা।

রাজ্য সরকার মোট উৎপাদিত আলুর ১৫ শতাংশ অর্থাৎ ১০ লক্ষ মেট্রিক টন আলু চাষিদের কাছ থেকে কিনবে বলে জানিয়েছে। কুইন্টাল প্রতি ৫৫০ টাকা অর্থাৎ ৫.৫০ টাকা কেজি দরে চাষিরা সরকারকে আলু বিক্রি করতে পারবে। বাকি ১ কোটি ৬০ লক্ষ মেট্রিক টন আলুর ভবিষ্যৎ কী? আলু নিয়ে ফি-বছরের ন্যায় চাষিকে গ্রামীণ ফড়ে, আড়তদারদের শরণাপন্ন হতে হবে যেখানে কেজি প্রতি ১-২ টাকার বেশি দাম চাষির পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। আবার একজন চাষি সরাসরি সরকারের কাছে সর্বাধিক ২৫ কুইন্টাল আলু বিক্রি করতে পারবে। কোন কোন চাষির কাছ থেকে আলু কেনা হবে তা তার নাম আলু চাষি হিসাবে নথিভুক্ত রয়েছে কি না, তা দেখে বিডিও ঠিক করবেন। অভিজ্ঞতা বলে, এই তালিকা তৈরির ক্ষেত্রেও চলবে ব্যাপক দলবাজি, দুর্নীতি। প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত বা ঋণগ্রস্ত চাষি সরকারি মূল্যে আলু বিক্রি করার সুযোগ পাবেন না। যাঁরাও সুযোগ পাবেন, তাঁদের শুধু নাম থাকলে হবে না— বিডিও-তে গিয়ে আগে জমির কাগজ, সচিত্র পরিচয়পত্র, কিষান ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে সরকারি চিরকুট সংগ্রহ করতে হবে। এই চিরকুট নিয়ে জমি থেকে আলু তুলে ৮ মার্চ থেকে ২২ মার্চের মধ্যে আলু নিয়ে হিমঘরে পৌঁছতে পারলে, তবেই সর্বোচ্চ ২৫ কুইন্টাল আলু বিক্রি করে ১৩, ৭৫০ টাকা পাওয়ার যোগ্যতা চাষি অর্জন করতে পারবেন। বোঝাই যাচ্ছে এই নিয়মে ভাগচাষি বা প্রান্তিক চাষিদের কোনও সুবিধা হবে না। অথচ এ রাজ্যে যে লক্ষ লক্ষ ভাগচাষি বা প্রান্তিক চাষিরা রয়েছেন, যাদের কাছে সরকারি ঋণের সুযোগ সহজে পৌঁছয় না। যাঁদের বেশি দামে সার-বীজ বা সেচের ব্যবস্থা করতে হয়, যাঁরা গ্রামীণ মহাজন-সুদখোরদের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করতে বাধ্য হন, যাঁরা সর্বাধিক সমস্যার মধ্যে পড়েন, তাঁদের সরাসরি আলু বিক্রি করার সুযোগ নেই। আবার যে চাষিদের পক্ষে দাঁড়িয়ে সরকার ৫.৫০ টাকা কেজি দরে আলু কিনছে তাঁরাও সর্বোচ্চ ১৩,৭৫০ টাকার বেশি সরকারের কাছ থেকে পাবেন না। বাকি আলু আড়তদারদের কাছে বিক্রি করতে হবে জলের দরেই। যার মধ্য দিয়ে চাষের খরচও ওঠা সম্ভব নয়।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে বেশি করে আলু খাওয়ার নিদান দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই আহ্বান কি অভাবগ্রস্ত চাষিকে বাজার ধরাতে পারবে? চাষিকে কি বাঁচানো যাবে? না, টোটকা, হেকিমি করে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আসলে দেশের কৃষি সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয়টি কেন্দ্রের বা এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার এড়িয়ে যেতে চাইছে। যা করলে চাষি বাঁচবে, সেই পদক্ষেপ না করে কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারই ভোটের দিকে তাকিয়ে কৃষি বাজেট তৈরি করেছে। ফুটো পাত্রে জল ঢালার মতো, ফোঁপরা বরাদ্দ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে চলছে রাজনৈতিক তরজা। যখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন, চাষির রোজগার দ্বিগুণ করবই, তখন মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, তিনগুণ করেই দিয়েছি। অথচ আমরা জানি, চাষির পাশে দাঁড়াতে রাজ্য যত রকম বরাদ্দ করেছে, (আগাম অনুদান, পেনশন, চাষির মৃত্যুতে অনুদান, ফসল বিমার প্রিমিয়াম এবং কৃষি দফতরের প্রশাসনিক খরচ) সব মিলে দাঁড়ায় মোট কৃষি বাজেটের তিন ভাগের দুই ভাগ। এক ভাগ থাকে চাষির রোজগার বাড়ানোর জন্য।

সরকার প্রচার করছে, 'কৃষক বন্ধু' প্রকল্পে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান চাষের খরচ কমাবে এবং রোজগার বাড়াবে। কিন্তু রোজগার বাড়ার বিষয়টি তো নির্ভর করে চাষির সব ফসল ঠিকমতো উঠল কি না বা চাষি সব ফসলের ঠিকমতো দাম পেল কি না তার উপরে। দুটোই তো অনিশ্চিত— প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্টও হতে পারে বা সব ফসল সহায়ক মূল্যে বিক্রি নাও হতে পারে। চাষিকে বাজার ধরাতে গেলে প্রয়োজন চাষির সমস্ত ফসল সরকারের পক্ষ থেকে লাভজনক দামে কিনে নেওয়া এবং পুনরায় ন্যায্য দামে জনগণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া, অর্থাৎ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা। এই দাবি বহুবার এসইউসিআই(সি) দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত করা হলেও কোনও সরকারই তাতে কর্ণপাত করেনি।

বর্তমানে বাজেটে পরিকাঠামো তৈরিতে কোনও বরাদ্দ বাড়ানো হয়নি। ভাল চাষের জন্য লাগে ভাল বীজ ও ভাল মাটি। নতুন বীজ তৈরি করা ও তার উপযুক্ত বণ্টন ব্যবস্থা তৈরি করা, যাতে সকল চাষি পরীক্ষিত ও শোধিত বীজ পায় এবং মাটির পরীক্ষা ও চাষিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রভৃতির জন্য যে বরাদ্দ দরকার ছিল তা বাজেটে নেই। কৃষি দফতরের অসংখ্য পদ শূন্য, যেখানে নতুন কোনও নিয়োগও হচ্ছে না, — এই প্রশ্নেও সরকার উদাসীন।

এ রাজ্যে একসময় ব্লকে ব্লকে কিষান মান্ডি, রাজ্য জুড়ে প্রচুর গুদাম ঘর তৈরি, বেশি চাহিদার ফসল ফলানোর ট্রেনিং দেওয়া প্রভৃতির যে ঘোষণা হয়েছিল তা প্রায় অপূরিতই থেকে গেছে। এক সময়ে মোদি সরকার, 'রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা' ঘোষণা করেছিল, শোধিত মাটি, উন্নত বীজ, খামার, ক্ষুদ্র সেচ ইত্যাদি পরিকাঠামোর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, বলেছিল এতে গরিব চাষির রোজগার বাড়বে।

ক্রমে করপোরেট পুঁজির ত্রাণে বিজেপি সরকারের তাগিদ যত বৃদ্ধি পেয়েছে তত কমেছে কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ। এর মধ্যেও যতটুকু অনুদান পাওয়া যায় তা নিয়েই কেন্দ্র-রাজ্য তরজা। রাজ্যের চাষিরা চূড়ান্ত প্রতারণা ও বঞ্চনার শিকার। কৃষির উন্নয়ন ও উপযুক্ত কৃষি পরিকাঠামো গড়ে তোলার কোনও পদক্ষেপ সরকারগুলির নেই। চাষিও ভুলতে বসেছে তার অধিকারের বিষয়টি। চাষি যদি ফসলের ন্যায্য দাম না পায়, চাষির রোজগার যদি না বাড়ে, শুধু বছরে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দিয়ে বা মাত্র ১০ . লক্ষ মেট্রিক টন আলু কিনে বা 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্প চালু করে চাষিকে সংকট থেকে বাঁচানো যাবে না।

আশাকর্মীদের ডেপুটেশন

১লা মার্চ পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন ডায়মন্ডহারবার সি এম ও এইচ নিকট এক ডেপুটেশন দেয়। আশাকর্মীদের তিন মাস বকেয়া স্থায়ী ভাতা ও ফরম্যাট এর পারিশ্রমিক অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়া,আশাকর্মীদের উপর প্রকল্প বহির্ভূত কাজ চাপানো বন্ধকরা,ফরম্যাট বাতিল করে মাসিক উপযুক্ত বেতন চালু করা,সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে ডি এ,টি এ বোনাস,পি এফ,পেনশন চালু করা সহ ১২ দফা দাবিতেই ছিল এই ডেপুটেশন। সাহানারা বেগম এবং শুভ্রা চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৮ জনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি জমা দেয়। সি এম ও এইচ বকেয়া টাকা শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

রাজ্যের ৪২টি আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই (সি)

১. কোচবিহার	প্রভাত রায়
২. আলিপুরদুয়ার	রবিচন রাভা
৩. জলপাইগুড়ি	হরিভক্ত সরদার
৪. দার্জিলিং	তন্ময় দত্ত
৫. রায়গঞ্জ	সুজনকৃষ্ণ পাল
৬. বালুরঘাট	(ঘোষিত হবে)
৭. মালদা উত্তর	সুভাষ সরকার
৮. মালদা দক্ষিণ	অংশুধর মণ্ডল
৯. জঙ্গিপুর	সামিরুদ্দিন
১০. বহরমপুর	আনিসুল আম্বিয়া
১১. মুর্শিদাবাদ	বকুল খন্দকার
১২. কৃষ্ণনগর	সেখ খোদাবক্স
১৩. রানাঘাট	পরেশচন্দ্র হালদার
১৪. বনগাঁ	স্বপন মণ্ডল
১৫. ব্যারাকপুর	প্রদীপ চৌধুরী
১৬. দমদম	তরুণ দাস
১৭. বারাসাত	তুষার ঘোষ
১৮. বসিরহাট	অজয় বাইন
১৯. জয়নগর	জয়কৃষ্ণ হালদার
২০. মথুরাপুর	পূর্ণচন্দ্র নাইয়া
২১. ডায়মন্ডহারবার	অজয় ঘোষ
২২. যাদবপুর	সুজাতা ব্যানার্জী
২৩. কলকাতা দক্ষিণ	দেবব্রত বেরা
২৪. কলকাতা উত্তর	বিজ্ঞান বেরা
২৫. হাওড়া	শানওয়াজ
২৬. উলুবেড়িয়া	মিনতি সরকার
২৭. শ্রীরামপুর	প্রদ্যোৎ চৌধুরী
২৮. হুগলি	ভাস্কর ঘোষ
২৯. আরামবাগ	প্রশান্ত মালি
৩০. তমলুক	মধুসূদন বেরা
৩১. কাঁথি	মানস প্রধান
৩২. ঘাটাল	দীনেশ মেইকাপ
৩৩. ঝাড়গ্রাম	সুশীল মাণ্ডি
৩৪. মেদিনীপুর	তুষার জানা
৩৫. পুরুলিয়া	রঙ্গলাল কুমার
৩৬. বাঁকুড়া	তন্ময় মণ্ডল
৩৭. বিষ্ণুপুর	অজিত বাউরি
৩৮. বর্ধমান পূর্ব	নির্মল মাঝি
৩৯. বর্ধমান-দুর্গাপুর	সুচেতা কুণ্ডু
৪০. আসানসোল	অমর চৌধুরী
৪১. বোলপুর	বিজয় দলুই
৪২. বীরভূম	আয়েষা খাতুন

এসইউসিআই(সি) বাম ঐক্য চায় সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থে নয়, গণআন্দোলনের প্রয়োজনে

মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (ইউনাইটেড)-এর কেন্দ্রীয় কমিটি কেরালার এর্নাকুলামে তাদের চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত থাকার জন্য এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষকে অনুরোধ করেছিল। তাতে সাড়া দিয়ে কমরেড প্রভাস ঘোষ দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড কে রাধাকৃষ্ণকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠান। ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি বক্তব্য রাখেন। ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআই(এমএল) রেড ফ্ল্যাগ, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, আরএমপি ইত্যাদি দলের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন।

কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বলেন, এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষ থেকে আমি এম সি পি আই (ইউ)-এর পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছি। আপনাদের কংগ্রেস ও সমস্ত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে তাঁর আন্তরিক অভিনন্দন আমি বহন করে এনেছি। আমি আশা করি, আমাদের সাধারণ শত্রু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাম ও গণতান্ত্রিক দল এবং শক্তিসমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে এই কংগ্রেস আরও জোরদার করবে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্ব জুড়ে কী ধরনের দস্যুবৃত্তি চালাচ্ছে, সে বিষয়ে আমরা বামপন্থীরা সচেতন। দুনিয়ার মেহনতি মানুষের উপর তারা সীমাহীন শোষণ-পীড়ন করে চলেছে। সাম্প্রতিক অতীতে তারা ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান, লিবিয়ার মতো বহু দেশে হানাদারি চালিয়ে নিজেদের কব্জায় এনেছে। এখন ভেনেজুয়েলার দিকে তাদের শ্যেন দৃষ্টি। এই অবস্থাতেও পুঁজিবাদী শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে ইউরোপ ও আমেরিকায় একের পর এক আন্দোলন গড়ে উঠছে, কিন্তু সঠিক নেতৃত্বের অভাবে সেগুলি সফল হতে পারছে না।

ভারতেও শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির অনুসৃত নীতির দৌলতে বিশেষ করে উদারিকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের মধ্য দিয়ে হাতে গোনা কিছু একচেটিয়া পুঁজিপতি বিপুল সম্পদের মালিক হচ্ছে, পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষ সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছেন। বেকারত্বের হার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আমরা বামপন্থী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ নই বলে প্রতিবাদ আন্দোলন দুর্বল। তাই সহজেই এ সব ঘটতে পারছে। মেহনতি মানুষের মহান শিক্ষক কমরেড লেনিন এ বিষয়ে স্পষ্ট দিকনির্দেশ করে বলেছেন, নিজেদের মধ্যে যতই মতবিরোধ থাকুক, সর্বসম্মত ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। তিনি আরও বলেছেন, সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি বামপন্থীদের উচিত নিজেদের মতপার্থক্যের

বক্তব্য রাখছেন কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ

বিষয়গুলিকে সর্বসমক্ষে আলোচনার জন্য তুলে ধরা। যাতে শুধু শ্রমজীবী মানুষই নয়, বামপন্থী দলের কর্মীরাও এ থেকে শিক্ষা নিতে ও সচেতন হতে পারেন। ঐক্য-সংগ্রাম-ঐক্যের নীতি এবং আচরণবিধির ভিত্তিতে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিচালিত হওয়া উচিত। এই পদ্ধতির মধ্য দিয়েই সঠিক রাজনৈতিক লাইন বেরিয়ে আসবে এবং জয়যুক্ত হবে।

১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার সময়ের কিছু অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে কমরেড রাধাকৃষ্ণ বলেন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হয়েছিল, এসইউসিআই(সি) তার শরিক ছিল। বিভিন্ন রাজ্যে তখন জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলন ('জে পি মুভমেন্ট') শুরু হলে সর্বত্রই আমরা সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। সেই আন্দোলনে সিপিএম-সিপিআইকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জয়প্রকাশজি বারংবার অনুরোধ জানালেও তারা সামিল হয়নি। এই আন্দোলনে, আরএসএস এবং জনসংঘ আছে —এই অজুহাত দেখিয়ে সিপিএম ও সিপিআই তাতে যোগ দেয়নি। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে, যথার্থ অর্থেই এটি একটি গণআন্দোলন। এই আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে বিভিন্ন শক্তি তাদের রাজনৈতিক লাইন অনুযায়ী ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এই সময়ে একটি যথার্থ বিপ্লবী পার্টির কর্তব্য হল, এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তার মধ্য দিয়ে আন্দোলনে বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই পথে বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিশালী হয়। কিন্তু সিপিএম ও সিপিআই লেনিনের এই শিক্ষা নিয়ে আন্দোলনে এল না এহং দুরে থাকল।

পরে সিপিএম-সিপিআই ও সহযোগী বামপন্থীরা যখন আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল, আমাদের দল এসইউসিআই(সি) তখন বলল, এই পশ্চিমবঙ্গ বামপন্থী আন্দোলনের ঘাঁটি। এখানে বামপন্থীরা নিজেরাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পারে। অন্য কারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু সিপিএম আমাদের এই বক্তব্যকে নস্যাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনকে আহ্বান জানায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। প্রফুল্ল সেন ছিলেন জনগণের চোখে অত্যন্ত ধিক্কৃত। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে তিনি গণআন্দোলনের উপর গুলি চালিয়ে বহু মানুষকে হত্যা করেছিলেন। এইরকম একজন ব্যক্তি আন্দোলনের নেতা হিসাবে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। এই নিয়ে আমরা প্রকাশ্যে সিপিএমের সমালোচনা করি। আমরা চেয়েছিলাম, এ হেন একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মহান লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে প্রকাশ্যে সুস্থ তর্কবিতর্ক হোক এবং সত্য সামনে আসুক। কিন্তু আমাদের সমালোচনায় আপত্তি জানিয়ে সিপিএম বলেছিল, যুক্ত আন্দোলনে প্রকাশ্যে সমালোচনা চলবে না।

আটের পাতায় দেখুন

সোভিয়েত বিরোধী প্রচার ও স্ট্যালিন

তিনের পাতার পর

নিজের স্বাধীনতা সে রক্ষা করতে পারে। রাশিয়ানরা কখনও ইংল্যান্ডের ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়েছে, ইতিহাসে এরকম একটি নজিরও পাওয়া যাবে না। কিন্তু ইংরেজরা রাশিয়ার ভূখণ্ডে আক্রমণ চালিয়েছে ও ভূখণ্ড দখল করেছে এমন নজির ইতিহাসে ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে।

মিঃ মরিসন বলেছেন যে, রাশিয়ানরা জার্মান প্রশ্নে, ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছে। এটি একটি ডাহা মিথ্যা এবং কত বড় মিথ্যা সেটা মিঃ মরিসনও জানেন। আসলে সত্য কী, সেটা সকলেই ভাল জানেন এবং তা হচ্ছে, এক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে রাশিয়ানরা অস্বীকার করেনি। আসলে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা আগেই জানত যে, রাশিয়ানরা কখনই জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থান ঘটানোর পথে যাবে না, পশ্চিম জার্মানিকে আগ্রাসন চালাবার ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করার পথে যাবে না।

তবে ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নে সহযোগিতা করতে রাশিয়া কখনই অস্বীকার করেনি। উল্টে রাশিয়া নিজেই প্রস্তাব দিয়েছে যাতে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের কর্মসূচি বাইরের হুকুমদারি ছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হুকুমদারি ছাড়া ইউরোপীয় দেশগুলির সমতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার নীতির ভিত্তিতে কার্যকর করা হয়।

একই ভাবে মিঃ মরিসন অভিযোগ করেছেন যে, জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা বলপ্রয়োগ করে ক্ষমতায় এসেছে। কমিনফর্ম জোর-জুলুম চালাচ্ছে ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকর্মে লিপ্ত রয়েছে। এসব কোনও অভিযোগেরই কোনও ভিত্তি নেই। কমিউনিস্টদের কুৎসা না করে যারা জল স্পর্শ করে না, একমাত্র তারাই এসব কথা বলতে পারে।

ঘটনা হচ্ছে, জনগণতান্ত্রিক দেশগুলিতে কমিউনিস্টরা সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ক্ষমতায় এসেছে। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, এই দেশগুলির জনগণ শোষকদের ও বিদেশি গুপ্তচর বাহিনীর এজেন্টদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এটাই জনগণের ইচ্ছা। কমিনফর্ম প্রসঙ্গে বলা যায়, জোরজুলুম ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারকার্যে কমিনফর্ম লিপ্ত আছে, এ কথা একমাত্র তারাই বলতে পারে যারা পুরোপুরি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। কমিনফর্ম-এর দলিলগুলি প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। সকলেই সেগুলি জানেন এবং কমিউনিস্টদের সম্পর্কে যাবতীয় কুৎসামূলক ও অবমাননাকর বক্তব্যকে দলিলগুলি পুরোপুরি মিথ্যা প্রমাণ করে দেয়।

এ প্রসঙ্গে খুব জোর দিয়েই আমরা বলতে চাই, বলপ্রয়োগ কমিউনিস্টদের কর্মপদ্ধতি নয়। বরং উল্টোটাই সত্য। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাস্তবে সাম্যবাদের শত্রুরা ও অন্যান্য বিদেশি গুপ্তচরবাহিনীর এজেন্টরাই জোরজুলুমের রাস্তা নেয়। তার দৃষ্টান্তের জন্য বেশি খোঁজাখুঁজির দরকার নেই। অতি সম্প্রতি ইরানের প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করা হয়েছে, লেবাননের প্রধানমন্ত্রী ও ট্রান্স-জর্ডনের রাজাকেও হত্যা করা হয়েছে। এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড এই দেশগুলির শাসন ক্ষমতায় জোর করে পরিবর্তন ঘটাবার একমাত্র মতলব থেকেই করানো হয়েছে। কারা এদের হত্যা করেছে? কমিউনিস্টরা বা কমিনফর্মের সমর্থকরা করেছে কি? এরকম একটি প্রশ্ন উত্থাপন করাটাই বরং মজার। মিঃ মরিসনই যেহেতু এ ব্যাপারে ভাল খোঁজখবর রাখেন, তাই সঠিক উত্তরটি পেতে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন।

মিঃ মরিসন বলেন, নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি হচ্ছে একটি আত্মরক্ষামূলক চুক্তি। আগ্রাসন চালাবার জন্য নয়, উল্টে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোই এর লক্ষ্য।

এ কথাই যদি সত্য হয়, তবে এই চুক্তির উদগাতারা কেন সোভিয়েট ইউনিয়নকে এতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাননি? কেন তাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ঘিরে সামরিক বেষ্টনী খাড়া করেছেন? কেন তারা সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুপস্থিতিতে গোপনে এই চুক্তি সম্পাদন করলেন? হিটলার ও জাপানের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন কি প্রমাণ দেয়নি যে, সে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়তে পারে এবং লড়তে চায়ও। এই চুক্তিতে যে নরওয়ে একজন স্বাক্ষরকারী— আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের লড়াই কি সেই নরওয়ের থেকেও খারাপ ছিল? এই উদ্ভট আচরণের কী ব্যাখ্যা হতে পারে?

সোভিয়েট সরকার প্রস্তাব দিয়েছিল, এই চুক্তিটি নিয়ে বিদেশ দপ্তরের মন্ত্রী পরিষদের সাথে আলোচনা করা হোক। নর্থ আটলান্টিক চুক্তিটি যদি ইংল্যান্ড-আমেরিকার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলকই হত, তবে সোভিয়েট সরকারের এই প্রস্তাবে তারা রাজি হল না কেন? তার কারণ কি এটাই নয় যে, এ চুক্তির মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালানো সম্পর্কে অনুচ্ছেদ রয়েছে, যেটা চুক্তির উদগাতারা সমাজের ব্যাপক অংশের মানুষের কাছ থেকে গোপন করতে চান! রাজি না হওয়ার কারণ কি এটাই নয় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণে সাহায্য করার জন্য ইংল্যান্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও বিমান ঘাঁটিরূপে পরিণত করতে লেবার সরকার সম্মতি দিয়েছে?

এ কারণেই সোভিয়েট জনগণ পুনরায় বলতে চায়, নর্থ আটলান্টিক চুক্তি হচ্ছে আগ্রাসন চালাবারই একটি জোট, যার টার্গেট হল সোভিয়েট ইউনিয়ন। এ ঘটনা বিশেষ করে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে কোরিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন দক্ষিণপন্থী চক্রের আগ্রাসী কার্যকলাপ থেকে। দু'বছরেরও বেশি সময় হয়ে গেল ইঙ্গ-মার্কিন সেনারা কোরিয়ার স্বাধীনতাকামী, শান্তিপ্রিয় জনগণকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, গ্রাম-শহরকে ধ্বংস করছে, নারী-শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করছে। ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির এই হিংস্র কার্যকলাপকে কি কেউ আত্মরক্ষামূলক বলতে পারে? কেউ কি বলবে যে, ইংরেজ সেনাবাহিনী কোরিয়ায় গিয়ে কোরিয়ার জনগণের হাত থেকে ইংল্যান্ডকে রক্ষা করছে? ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর এইসব কার্যকলাপকে সামরিক আগ্রাসন বলাই কি অধিকতর সততার পরিচায়ক হবে না? মিঃ মরিসন পারেন তো এমন কী একজন সোভিয়েট সৈন্যকেও দেখান, যে শান্তিপ্রিয় জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে। না, এমন একজন সোভিয়েট সৈন্যও নেই। এবং মিঃ মরিসন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিন যে, কেন ইংরেজ সৈন্যরা কোরিয়ার শান্তিপ্রিয় জনগণকে হত্যা করছে, কেন ইংরেজ সৈন্য স্বদেশ থেকে বহুদূরে এক অচেনা দেশে গিয়ে মারা যাচ্ছে? এ কারণেই সোভিয়েট জনগণ মনে করে, বর্তমান ইঙ্গ-মার্কিন রাজনীতি একটি নতুন বিশ্বযুদ্ধে প্ররোচনা দিচ্ছে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

এআইডিএসও-র নেতৃত্বে হস্টেল আন্দোলনের জয়

কর্ণাটকের হনুমানথ নগরে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিক্যালের এস সি, এস টি হস্টেলে দীর্ঘদিন ধরে নিম্নমানের খাবার দেওয়া হচ্ছিল। টয়লেট ছিল অপরিচ্ছন্ন, পাশের এক নির্মীয়মান বিল্ডিং-এর ধুলোয় বসবাস করাই দায় হয়ে উঠেছিল। হস্টেলে ছিল শয্যা সংখ্যার অভাব, সকলের জন্য চেয়ার টেবিলও ছিল না, ছিল বিদ্যুৎ সমস্যাও।

ছাত্ররা কর্তৃপক্ষকে বারবার জানালেও কোনও প্রতিকার হয়নি। আন্দোলন তীব্রতর করার লক্ষ্য নিয়ে ছাত্ররা এআইডিএসও-র সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারপর ঘোষিত হয় অনশন ধর্মঘট। আন্দোলন কিছুদূর এগোতেই শয্যা, টেবিল, চেয়ার আসতে শুরু করে। অন্যান্য দাবিগুলিও পূরণের লিখিত আশ্বাস দেওয়া হয়। তারপর ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়। ছাত্রদের বক্তব্য এই আন্দোলন কর্ণাটকে হস্টেল আন্দোলনের মডেল হিসাবে কাজ করবে।

এআইইউটিইউসির রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

১ মার্চ মধ্যপ্রদেশের গুনা শহরে অনুষ্ঠিত হল শ্রমিকদের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি-র উদ্যোগে সারাদিনের এই শিক্ষাশিবিরে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী দার্শনিক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে' পুস্তকটি পড়ে আসতে বলা হয়েছিল।

ভোপাল, গোয়ালিয়র, গুনা, অশোকনগর থেকে প্রতিনিধিরা শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শ্রমিকদের নানা প্রশ্ন এবং সেগুলি সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে তা আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড সুনীল গোপাল এবং এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর গুনা জেলা সম্পাদক কমরেড প্রদীপ আর বি।

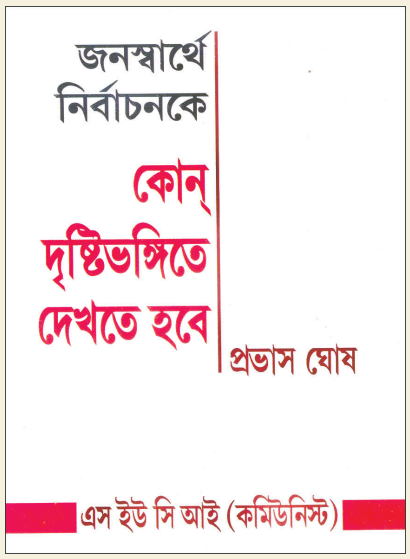

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) প্রকাশিত এই পুস্তিকাটি প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে দিন। বাস, ট্রেন, হাট, বাজার, স্টেশন সহ সর্বত্র বইটির ব্যাপক প্রচারের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করুন।

গণআন্দোলনের প্রয়োজনে বামঐক্য

সাতের পাতার পর

সেই থেকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনগুলিতে তারা আমাদের দলের সঙ্গে ঐক্য চায় না।

আজ এস ইউ সি আই (সি) বাম-গণতান্ত্রিক দলগুলির কাছে আহ্বান জানাচ্ছে, একচেটিয়া পুঁজিপতি ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির শোষণ এবং কংগ্রেস ও বিজেপি উভয় দলের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ যুক্ত আন্দোলন গড়ে তোলার। এই সময় যে কোনও মূল্যে সংসদে কিছু আসন বাগিয়ে নেওয়ার জন্য বিজেপির ফ্যাসিবাদী নীতির হাত থেকে বাঁচার ধুয়ো তুলে সিপিএম-সিপিআই কংগ্রেসের সঙ্গে রফা করতে ব্যস্ত।

অথচ বিজেপির বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তুলতে এবং বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলায় তাদের এতটুকু আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। নির্বাচনে সুবিধা পাওয়াই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ কথা বলে কমরেড রাধাকৃষ্ণ তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

নৌকা নিয়ে নদীপথ অবরোধ বিপন্ন মৎস্যজীবীদের

কৃষিকাজের অবস্থা ভাল নয়। কাজের আশায় মানুষ চলে যায় অন্য রাজ্যে-দেশে। যারা যায় না তারা নদী ও খাঁড়ি থেকে মাছ ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। সুন্দরবন সংলগ্ন বিশাল এলাকার এক বড় অংশের জীবনধারা এরকমই। এমন পরিবারের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দু'লাখ। সরকার চাইলে এখানে শিল্প গড়ে উঠতে পারত। কিন্তু বছরের পর বছর তা হয়নি। মাছ ধরতে গিয়ে প্রায়শই বাঘ-কুমির-জলদস্যু-প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিতে প্রাণ চলে যায় দরিদ্র মানুষগুলোর। তবু দু'মুঠো অন্নের তাগিদে পুরুষানুক্রমে এই বিপদসংকুল কাজ করতেই হয় তাদের।

এই ভাবে একরকম চলছিল। ১৯৮২ সালে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষার অজুহাতে সুন্দরবনের দ্বীপ ও জলে মৎস্যজীবীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার আইন জারি করে। ফলে, তারা জলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। প্রসঙ্গত, ব্রিটিশ আমলেও একবার এহেন আইন জারির ষড়যন্ত্র হয়েছিল। সে সময়ে মৎস্যজীবী এবং রানী রাসমণির প্রতিবাদে তা সফল হয়নি। কিন্তু স্বাধীন দেশের সরকার বিকল্প কোনও কাজের ব্যবস্থা না করেই মৎস্যজীবীদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। এই কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত বনদপ্তর মৎস্যজীবীদের বিএলসি পাশ (নৌকার লাইসেন্স), মেরিন লাইসেন্স, রেজিস্ট্রি লগ বই, জাল ইত্যাদি সহ মাছ ধরার সামগ্রী কেড়ে নিতে দৈহিক অত্যাচার করছে, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে ১৪ মার্চ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশন নদীপথ অবরোধের কর্মসূচি নেয়। এতে বাসন্তীর হেড়োভাঙা নদী, গোসাবার দুর্গা দেওয়ানী নদী, কুলতলির চিতুড়ী ও পেটকুলচাঁদ নদী, রায়দীঘির মণি নদী ইত্যাদি জলপথের পরিবহন ব্যাপক প্রভাবিত হয়। একের পর এক নৌকার বেষ্টনীতে বড় বড় জাহাজ দীর্ঘক্ষণ আটকা পড়লে দেশ-বিদেশের পর্যটক সহ নানা সংবাদমাধ্যম দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আন্দোলনের খবর পায়। তাদের পক্ষ থেকেও আসে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন।

অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক, এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছি। সমস্ত জায়গায় চিঠিপত্র, স্মারকলিপি দিয়েছি। কিন্তু কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। সুন্দরবনে মৎস্যজীবীরা ১০ হাজার যন্ত্রবিহীন এবং ৭ হাজার যন্ত্রচালিত নৌকা দিয়ে মাছ ধরে। এর মধ্যে ব্যাঘ্র প্রকল্প ৯৩২টি এবং রিজার্ভ ফরেস্ট ৪৪৪২টি মাত্র বিএলসি দিয়েছে। এই বিএলসি-র শতকরা ৪০ ভাগ পেয়েছে মৎস্যজীবী নয় এমন ব্যক্তিরা। বন দপ্তর ইতিমধ্যে ১৭০০ অ-মৎস্যজীবীদের বিএলসি বাতিল করেছে। কিন্তু এখনও প্রায় ১২ হাজার নৌকার বিএলসি হয়নি। এই কারণে তাদের জীবন বিপন্ন, অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটছে। ফলে, বিএলসি দেওয়া নিয়ে চলছে ব্যাপক দুর্নীতি ও দলবাজি। আমরা প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অবিলম্বে বিএলসি দেওয়ার দাবি করছি।" 'মৎস্যজীবী-স্বার্থবিরোধী সমস্ত আইন দ্রুত বাতিল করা না হলে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠবে।

বিজেপি সরকার শ্রমিক ছাঁটাইয়ের খড়্গ আরও ধারালো করছে

'বর্তমানে সংগঠিত ক্ষেত্রে স্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। বাড়ছে ঠিকা শ্রমিক। এই সমস্ত ঠিকা শ্রমিকরা সীমাহীন বঞ্চনার শিকার। সমকাজে সমবেতন সহ সমস্ত প্রাপ্ত অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত। এই সব নির্যাতিত অসহায় শ্রমিকের লড়াইয়ের পাশে না দাঁড়ালে নিয়মিত কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার কোনও নৈতিক অধিকার থাকে না'— ৮ মার্চ কলকাতায় সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অল ইন্ডিয়া পাওয়ার মেন্স ফেডারেশনের ২য় রাজ্য সম্মেলনে এ কথা বলেন প্রধান বক্তা সংগঠনের সভাপতি তথা এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর সাহা।

এদিন রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংবহন ও বণ্টনকোম্পানি এবং ডি ভি সিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের পাঁচটি ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সম্মেলন ছিল। বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, শ্রম আইন সংশোধনের নামে লেবার কোড চালু করেছে বিজেপি সরকার। ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্টকে আইন সিদ্ধ করছে সরকার, যাতে শ্রমিকরা ইউনিয়ন গড়ে তুলে ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করতে না পারে, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পারে। শ্রমিক আন্দোলনে সুবিধাবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতার সমালোচনা করে তিনি মালিক শ্রেণির শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমর সাহা। সভাপতিত্ব করেন কমরেড কৃষ্ণ মজুমদার। সম্মেলন থেকে কমরেড মানস সিনহাকে সভাপতি এবং কমরেড আনন্দ ঘোষকে সম্পাদক করে ২৫ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com